আরেক রকম

নবম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যা
১৬ এপ্রিল-১৫ মে ২০২১ ১-৩১ বৈশাখ ১৪২৮

মূল্য : ৫০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com
সম্পদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

অনলাইন পড়তে : www.arekrakam.com
ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/arekrakam

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

নবম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যা ১৬ এপ্রিল-১৫ মে ২০২১,
১-৩১ বৈশাখ ১৪২৮

Vol. 9, Issue 8th & 9th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয় ৫

নববর্ষের এদিক-ওদিক— **পবিত্র সরকার** ৭

ভাষার জন্য— **মালিনী ভট্টাচার্য** ১১

একত্বের সন্ধান— **সৌরীন ভট্টাচার্য** ১৫

গৌরীপদ দত্ত (১৯২৭-২০২০)— **অমিয় কুমার বাগ্‌চী** ২০

সংকটোত্তর বিশ্ব অর্থনীতি— **আজিজুর রহমান খান** ২৩

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি?— **মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত** ২৭

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে— **অরুণ সোম** ৩৩

শ্রমিক কৃষক সংহতির নতুন সম্ভাবনা— **অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়** ৩৭

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই: ইতিহাসের শিক্ষা— **রজত রায়** ৪১

নির্বাচনী যাত্রাপালা— **মালবী গুপ্ত** ৪৯

ভোট-বৈশাখ— **শুভময় মৈত্র** ৫১

আত্মচিন্তা 'ভয়ঙ্কর'? আহা, কী 'সেকুলার'!— **রূপসা** ৫৪

গানের মধ্যে ভাগাভাগি— **পলাশ বরন পাল** ৫৭

সুকুমার রায়ের মৃত্যু: দায়ী কে?— **আশীষ লাহিড়ী** ৬২

করোনা কাল প্রসারিত হচ্ছে— **মানস প্রতিম দাস** ৬৫

অন্তরিনের মুক্তগদ্য— **স্বপন ভট্টাচার্য** ৬৮

অর্ধশতকের ওপার থেকে দেখা মুক্তিযুদ্ধ ও কলকাতা— **স্বাগতম দাস** ৭১

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র: অপরিচয়ের পরিসর— **সুমন ভট্টাচার্য** ৭৪

ভারতপথিক নির্মলকুমার বসু— **সৃজা মণ্ডল** ৭৮

প্লে-স্কুল, হ্যালোজেন ও শ্যামাপোকা— **অম্লানকুসুম চক্রবর্তী** ৮৪

অক্ষয়বটের দেশ— **কালীকৃষ্ণ গুহ** ৮৭

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: শৈলজ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক
কে কে পুরী, নিউজ ডিস্ট্রিবিউটার্স
৯ ডেকার্স লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা
বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৭০০০.০০ টাকা দিয়ে "সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি?

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

অর্থনীতির ভিত ছাড়া সংস্কৃতি কি মজবুত রাজনীতির দেওয়াল হতে পারে?

আমরা যখন এই প্রবন্ধ লিখছি, রাজ্যে তখন বিধানসভা নির্বাচন চলছে– তাই বাংলার রাজনীতি থেকে নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। এই নির্বাচনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অনেকগুলো পরিচিত উপাদান মিশেছে, আর তার ওপর রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলগুলির প্রতি বিক্ষোভ তো আছেই। কিন্তু এ বারের নির্বাচনে দুটো বেশ অভিনব উপাদান এই পরিচিত মিশ্রণে সংযোজিত হয়েছে– প্রথমত, সাম্প্রতিক কালে এই প্রথম রাজ্য নির্বাচনে মতাদর্শের দিক থেকে তিনটে খুব আলাদা ধারার রাজনীতির মধ্যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব– তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, এবং বাম-জোট। এর আগেও তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে ২০১১ সালে তৃণমূলের এবং ২০১৬ সালে বামফ্রন্টের নির্বাচনী সমঝোতা ছিল। কিন্তু আরো বড়ো কথা, মতাদর্শগতভাবে বিজেপি বাকি দলগুলি থেকে অনেকটা আলাদা। তার একটা দিক অবশ্যই হল হিন্দুত্ববাদ এবং বিভাজনের রাজনীতি। কিন্তু আর একটি দিক নিয়ে তুলনায় আলোচনা কম হচ্ছে– সেটা হল, সাংস্কৃতিক। বিজেপি মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় একটি দল, যার বাংলার মাটিতে শিকড় খুব গভীর নয়।

কেউ কেউ বলছেন বটে যে, বিজেপি আসলে ঘরে ফিরছে– তার পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘের জন্ম তো এই বাংলার মাটিতেই– কিন্তু সে কথা যদি মেনেও নেওয়া যায়, তবু এই জন্মান্তরে বিজেপি-র রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 'বাঙালিত্ব' বা 'বাঙালিয়ানা' বলতে আমরা যা বুঝি, তার কিছু মৌলিক বিরোধ আছে। সেই বিরোধের কথা তুলেও অনেকে বলছেন, 'বাঙালিত্বের' অস্তিত্বরক্ষার জন্য বিজেপি-কে আটকানো দরকার। অনেকে আবার আশা করছেন, চরিত্রে মৌলিকভাবে 'বাঙালিত্বের' মিশ্রণ কম হওয়ার কারণেই বিজেপি শেষ অবধি বাংলায় 'বহিরাগত' হয়েই থেকে যাবে, রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের নাগালে আসবে না। এখানে বলে রাখা ভালো যে, 'বাঙালিত্ব' কথাটাকে এখানে সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, আঞ্চলিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। কেউ যেমন বাংলায় জন্মে, বসবাস করে, এবং আঞ্চলিক পরিচিতির দিক থেকে বাঙালি হয়েও বাঙালিত্ব-বর্জিত হতে পারেন, আবার সে রকমই কেউ বাংলার বাইরে (এমনকী বিদেশে) জন্মে বা বাংলার বাইরে বসবাস করে বা আঞ্চলিক পরিচিতির দিক থেকে বাঙালি না হয়েও বাঙালিত্বে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

রাজনীতির ময়দানে শেষ অবধি কী হবে, সেই প্রশ্নে ঢুকব না। বরং প্রশ্ন করা যাক, বাঙালিত্ব বলতে কী বোঝায়?

এটা ঘটনা যে, ভারতের সব রাজ্য বা অঞ্চলেরই যেমন নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্র ও সামাজিক রীতিনীতি আছে, সে বিষয়ে একটা গর্বও আছে। বাঙালির বাঙালিত্বই হোক, গুজরাতি অস্মিতাই হোক, মারাঠি মানুষই হোক, তামিলনাড়ু থেকে পঞ্জাব, কেরল থেকে কাশ্মীর, অসম থেকে রাজস্থান, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান আর তার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব– এই দুটো দিকই দেখতে পাওয়া যাবে। 'বাঙালিত্ব' নামক বায়বীয় বস্তুটিকে যদি ভেঙে অথবা খুলে দেখা যায়, তা হলে তার কয়েকটা সুনির্দিষ্ট দিকচিহ্ন পাওয়া যাবে। উনিশ শতকের নবজাগরণ থেকে পাওয়া উদার বিশ্ববীক্ষা, বহুত্ববাদে বিশ্বাস, বিজ্ঞানমনস্কতা যেমন তার একটি দিক, তার আর এক দিক হল লোকসংস্কৃতির এক বহমান ধারা, যাতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও দর্শনের উপধারা এসে মিশেছে– যেমন বাউল গান, যাতে আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের সঙ্গে মিশেছে মানবিকতা ও সমন্বয়ী ভাবধারার কোমল স্পর্শ। তেমনই আবার বাংলা ভাষা, ও সেই ভাষাবাহিত সংস্কৃতিও এই বাঙালিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত, সেই সংস্কৃতির মধ্যেই বাঙালিত্বের অন্যান্য চরিত্রলক্ষণগুলি ঢুকে পড়ে। অর্থাৎ, বাঙালিত্ব বস্তুটি মূলত তার সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। নিন্দুকে বলবে যে, অলস, উদ্যোগহীন, মুখেন মারিতং জগৎ চরিত্রটিও বাঙালির মজ্জাগত; অথবা গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী তৈরি করে নিরন্তর কোন্দল

করে চলাও বাঙালিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু, প্রথমত এ হল মূলত বাঁধা মাইনের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে একটা ছাঁচে ফেলা সামাজিক পর্যবেক্ষণ– তার বাইরে একটা বড়ো শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে কথাটি খাটে না। আর তা ছাড়া চরিত্রের এই দিকগুলো নিয়ে কেউ গর্ব করেন বলে সন্দেহ হয় না। অতএব, যে বাঙালিত্বের সঙ্গে বিজেপির ভাবধারার চরিত্রগত বিরোধ, এবং যে বাঙালিত্বের অস্ত্রে এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকানোর কথা ভাবছেন কেউ কেউ, সেটা মূলত সাংস্কৃতিক, ইতিবাচক বাঙালিত্ব।

আমরা জানি যে, 'সংস্কৃতি' কথাটির মধ্যে অনেক কিছু নিহিত আছে– তাই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাও থেকে যায়। এক দিকে সংস্কৃতি বলতে যেমন শিল্প সাহিত্য সংগীত এবং সে বিষয়ে রুচি বোঝায়, তেমন আবার কথাটি জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি, ও আচার-আচরণ ইত্যাদি বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। তথাকথিত উচ্চমার্গের (যাকে high brow বা elite culture বলা হয়) এবং লোকসংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ আছে, তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণির কাছে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার বাইরেও সংস্কৃতির একটা বড়ো পরিধি আছে এবং এ সবের মধ্যে সম্পর্ক সব সময়ে অনায়াস সমন্বয়ের বা প্রীতিমূলক সহাবস্থানের, তা-ও নয়। কিন্তু একই কথা খাটে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে– কে ব্যবহার করছেন, কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে, কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মধ্যে অনেক বৈচিত্র; কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সাধারণ চরিত্র আছে বলেই তাকে আমরা বাংলা ভাষা বলে বর্ণনা করি। তাই আপাতত এই জটিলতা সরিয়ে রেখে আলোচনার সুবিধার্থে 'বাংলা সংস্কৃতি' বলে একটা কিছু আছে, সেটা ধরে নিয়েই এগোনো যাক।

এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কোন বা কার বাংলা সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে? যতই হোক, বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে বহু ধারা মিশে আছে, তার কোনটা উচ্চ কোনটা নিম্নমার্গের, কোনটা কালোত্তীর্ণ কোনটা সাময়িক, তা কে ঠিক করবে? আর এই লেখাটিতে যে উদাহরণগুলো দেব, তার থেকে মনে হতে পারে যে, আমরা এক ধরনের নাগরিক এলিট বঙ্গসংস্কৃতিকেই "উচ্চমার্গের" সংস্কৃতি বলছি। এখানে দুটো কথা বলা দরকার। আমরা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ের থেকে উদাহরণগুলো নির্বাচন করেছি, তাই এই চয়ন নৈর্ব্যক্তিক নয়– যে কোনো ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা সূত্রে আহৃত উদাহরণের মধ্যে তার নির্বাচনে একটা পক্ষপাত থাকতে বাধ্য। তার মধ্যে কোনো শ্রেণিবিভাগ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়– লালন ফকিরের গান আর রবীন্দ্রসংগীত, পাঁচালি আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, সলিল চৌধুরীর গণসংগীত আর শচীন বা রাহুল দেব বর্মণের আধুনিক গান, পটশিল্প থেকে নন্দলাল বসু, চিত্তপ্রসাদ থেকে গণেশ পাইন– এমন কোনো নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড নেই যাতে এদের মধ্যে গুণমানের (ব্যক্তিগত পছন্দের নয়) তুলনা করা যায়।

কিন্তু, একই সঙ্গে এই কথাটাও বলে রাখা যাক, আমরা মনে করি না যে সব সংস্কৃতি গুণগতভাবে তুল্যমূল্য। অর্থাৎ, নাগরিক সমাজেই হোক বা লোকসমাজে, যেকোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ঘরানার মধ্যে একটা অংশকে যদি উচ্চমার্গের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করতে হয়, অন্য একটা অংশকে প্রাকৃত সংস্কৃতি বলেও চিহ্নিত করতে হবে। সেই শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি কী হবে? এই প্রশ্নটার একটা উত্তর হতে পারে এই রকম – এক, যদি কোনো সংস্কৃতি অর্জন করতে খানিকটা পরিশ্রম বা চর্চা বা সাধনা করতে হয়; দুই, যদি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সেই সংস্কৃতিকে বহমান করার তাগিদ থাকে; এবং তিন, সেই সংস্কৃতি যদি সেই গোষ্ঠীর বাইরে থেকে এসে কেউ যথাযথ চর্চা করেন তার উৎকর্ষ উপলব্ধি করবেন – তবে সেই সংস্কৃতিকে আমরা উৎকর্ষের বিচারে উচ্চমার্গের সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করব। এই লেখায় বহু বার উচ্চমার্গের সংস্কৃতি বা কাছাকাছি গোত্রের শব্দ ব্যবহৃত হবে। যদিও আগের অনুচ্ছেদেই আমরা স্বীকার করেছি যে আমাদের উদাহরণ চয়নের মধ্যে একটা পক্ষপাত আছে, কিন্তু আরো এক বার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন: আমরা মনে করি না যে আমাদের ব্যবহৃত উদাহরণগুলিই উচ্চমার্গের সংস্কৃতির একমাত্র উদাহরণ। এইখানে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা আমরা নির্ধারণ করলাম, গোটা লেখায় সেই সংজ্ঞা অনুসারেই শব্দটিকে বুঝতে হবে।

এই বারে প্রশ্ন– এই 'সংস্কৃতি' নামক বস্তুটাকে কি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করা যায়? বিভেদমূলক হিংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে কি গড়ে তোলা যায় এক অদৃশ্য দেয়াল? বাংলা ভাষায় লিখে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করলে ইতিহাস অট্টহাস্য করে উঠতে পারে। বাংলাই তো সেই ভাষা, যা একটা নয়, দুটো ভাষা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, আর অসমে। সেই ভাষা আজ রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারবে না? এ ক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি, পূর্ব পাকিস্তান বা অসম, উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রশক্তি ভিন্ন ভাষাকে বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিতে চাওয়ায়, বাংলা ভাষাকে তার প্রাপ্য গুরুত্বটুকুও না দিতে চাওয়ায়। ভবিষ্যতে কী হবে তা বলা যায় না, কিন্তু বর্তমানে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি আগ্রাসন সে তুলনায় কিছুই নয়। এবং, এখনও হিন্দির পিছনে যে রাষ্ট্রীয় মদত, তা প্রচ্ছন্ন। তাতে দখলদারি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু এখনও একাধিপত্য নেই। ফলে, ভাষার বিপন্নতা দিয়ে

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আবেগের সূত্রে বাঁধার অবকাশ পশ্চিমবঙ্গে এখনও নেই।

ফলে, ভাষা বা সংস্কৃতিকে যদি প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠতে হয়, তা হতে হবে ভাষা বা সংস্কৃতির প্রতি গর্বের জায়গা থেকে, অথবা তার ব্যবহারিক উপযোগিতার কারণে। এই প্রশ্নের উত্তর যে যাঁর মতো করে খুঁজতে পারেন, অবশ্যই। আমরা যেহেতু পেশাগত দিক থেকে– এক জন প্রত্যক্ষভাবে, আর অন্য জন খানিক ঘুরপথে– অর্থনীতির চর্চা করি, তাই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব অর্থশাস্ত্রের চৌহদ্দিতে। এখানে গোড়াতেই একটা আপত্তি উঠতে পারে– সংস্কৃতির মতো বিষয়ের সঙ্গে কি অর্থনীতির সম্পর্ক তেল আর জলের নয়? এই দুটো জিনিস আদৌ মিশ খায়? ভ্যান গঘ থেকে ঋত্বিক ঘটক, সাদাত হোসেন মান্টো থেকে জীবনানন্দ দাশ– কে আর কবে বাজারের তোয়াক্কা করে শিল্প তৈরি করেছেন? ক্রেডিট কার্ডের বিজ্ঞাপনের ভাষা ধার করে বরং বলা যায়, কিছু কিছু জিনিস আছে, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় না– সংস্কৃতি তো সে রকমই একটা জিনিস। তা হলে, সংস্কৃতির অলৌকিক প্রশ্নটাকে অর্থশাস্ত্রের লৌকিক পরিসরে এনে ফেলা কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর লেখার শুরুতেই দিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু, আমাদের আশা, এই লেখা ধাপে ধাপে যেভাবে এগোবে, তাতে নিজে থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কেন সংস্কৃতির প্রশ্নটাকে অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে দেখা জরুরি।

সংস্কৃতির অন্য উপাদানগুলোর কথায় আসার আগে গোড়ায় ভাষার প্রশ্নটাকে তোলা যাক। বাংলা ভাষা নিয়ে গর্বের প্রশ্ন– হিন্দির আগ্রাসন সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ তৈরি করার জন্য নিজের ভাষা নিয়ে যে গর্বটা থাকা একেবারে জরুরি শর্ত। ধরে নিতেই পারি, মাতৃভাষা নিয়ে প্রত্যেক বাঙালির গর্ব আছে। কার গর্বের পরিমাণ কতখানি, সেই বিচারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই– আপাতত ধরে নেওয়া যায় যে, কারও সঙ্গে কারও গর্বের পরিমাণের তুলনা করা যায় না। কিন্তু, সেই গর্বটা তাঁদের ব্যক্তিগত বনাম ব্যবহারিক জীবনযাত্রাকে কতটা প্রভাবিত করছে, সেটা দেখা যেতে পারে। এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো যে, নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা মানেই অন্য ভাষা বা সংস্কৃতির বিরোধিতা করা নয়। এখানেও সমন্বয় আর বিরোধিতা এই দুটি মডেল আছে– "নিজের রাজ্যে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলব না", এই অবস্থানটা যাঁরা নেন তাঁরা মাতৃভাষার প্রতি গর্ববোধ থেকেই গ্রহণ করেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এখন নিকটবর্তী রাজ্য থেকে সদ্য আসা এক জন দরিদ্র শ্রমিক, যিনি হিন্দি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, তাঁর ক্ষেত্রে এটার প্রয়োগ আর যাঁরা সুযোগ সত্ত্বেও বাংলা শেখা বা বলার বা বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোর চেষ্টা করেন না (যেমন দোকানের বা পথনির্দেশের সাইনবোর্ডে আদৌ বাংলা না থাকা, বা যিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, তাঁর সাথে হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা বলা) তাঁদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হোক, এটা চাওয়ার মধ্যে একটা বড়ো তফাত আছে। নিজেদের কথা বলতে গেলে বলব যে, আমরা উগ্র প্রাদেশিকতা বা 'আমরা বাঙালি' গোছের মানসিকতা কখনো সমর্থন করি না। আমাদের কাছে বাঙালিয়ানার একটা বড়ো দিক হল পরকে আপন করার অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসিকতা, আপনকে পর করার বিভেদমূলক মানসিকতার ঠিক যা বিপরীত। এবং সাংস্কৃতিক বলয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর খুব বেশি হাত চালানোর পক্ষপাতী নই– কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা ও ব্যবহার যে কিছু কিছু পরিসরে অনভিপ্রেতভাবে সরে যাচ্ছে, এবং তা নিয়ে কিছু করা আমাদের কাছে পরিবেশরক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অবস্থানটা পরিষ্কার করে এ বার আসি একটা অন্য প্রশ্নে– বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এই গর্ব করার ক্ষমতাটা কি মানুষের আর্থিক অবস্থানের সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা নয়? রাজ্য থেকে যত মানুষ ভিন্ রাজ্যে দক্ষ, অর্ধদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যান, তাঁদের কাছে হিন্দিতে কথা বলতে পারা কি একটা বাড়তি যোগ্যতা নয়, যার মাধ্যমে তাঁরা আর একটু ভালো জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখতে পারেন? তেমন মানুষরা কি মাতৃভাষার গর্বে গর্বিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি বয়কট করার ডাকে সাড়া দেবেন? কেউ বলতেই পারেন, এই ধরনের মানুষের কাছে হিন্দি বলতে পারা এক অর্থে একটা 'অ্যাসপিরেশন'। যাঁরা সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থানের কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ফলে ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ, এবং বাংলা-ইংরেজির দ্বিভাষিক পরিমণ্ডল থেকেই জীবিকানির্বাহ করতে সক্ষম, তাঁদের পক্ষে এই অ্যাসপিরেশন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন।

অর্থাৎ, ভাষার মতো সংস্কৃতির একেবারে প্রাথমিক উপাদানটির ক্ষেত্রেও জড়িয়ে যাচ্ছে অর্থনীতির প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাকেই আমরা একটু অন্যভাবে পেশ করতে পারি। খোঁজ করতে পারি: ভাষা, বা বৃহত্তর অর্থে অবসরবিনোদনের জন্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নানা পণ্য আছে (যার মধ্যে সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, কলা ও কারুশিল্প, যাত্রা-নাটক সবই ধরা যেতে পারে) সেগুলি কি এক ধরনের লাক্সারি গুড বা বিলাসপণ্য? এখানে নৃতত্ত্বের ভাষায় সংস্কৃতিকে জীবনধারণের নানা আচার এই অর্থে নয়, খানিকটা সংকীর্ণ অর্থে অবসর ও বিনোদনমূলক নানা কর্মকাণ্ডের অর্থে বোঝাতে চাইছি। অর্থশাস্ত্রে লাক্সারি গুড-এর সংজ্ঞা এইরকম: মানুষের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে যে যে পণ্য, সেবা, ও পরিষেবার চাহিদা বাড়ে, অতএব উপভোগও বাড়ে, তাকেই বলে লাক্সারি গুড। বলে রাখা ভালো যে, বিলাসপণ্য মানে

'বিলাস' করার উপকরণ নয়– যা-ই আবশ্যক নয়, অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞায় তাকেই বিলাসপণ্য ধরা হয়। সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে আবশ্যক পণ্যের চাহিদা কমে, আর বিলাসপণ্যের চাহিদা বাড়ে। আমরা এই ক্ষেত্রে জানতে চাই যে, সংস্কৃতি কি এমন একটা পণ্য, মানুষের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যার চাহিদা বাড়ে; বা মানুষ যখন একটা সীমার নীচে আয় করে, তখন তার সংস্কৃতি উপভোগ করার সাধ্য থাকে না? সংস্কৃতি বা ভাষাকে যদি রাজনৈতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তা হলে জানা প্রয়োজন যে, জনসাধারণের কত অংশের পক্ষে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব– কত শতাংশ অস্ত্রটি ব্যবহার করার মতো জায়গায় আছেন, এবং কত শতাংশের কাছে অস্ত্রটির আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে। সেই কারণেই বোঝা প্রয়োজন, ভাষা বা সংস্কৃতি অর্থনৈতিক 'পণ্য' হিসেবে ঠিক কোন চরিত্রের।

এই ক্ষেত্রে আরো একটা কথা স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো– 'সংস্কৃতি' বলতে অনেক সময়েই 'হাই কালচার' বা 'উচ্চমার্গের সংস্কৃতি'-কে বোঝানো হয়। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মহলে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব এবং বাংলাচর্চার আপাত- নিম্নমুখী ধারা নিয়ে আশঙ্কা অবশ্যই সেই 'হাই কালচার'-এর অন্তর্গত। তবে শুধু তাই নয় – বাংলা ভাষার প্রতি মমতা এই বৃত্তের বাইরেও কিছু কম নয়। রাজ্যের বাইরে (দেশে বা বিদেশে) বাংলা বলতে শুনে অন্য বঙ্গভাষীদের আন্তরিক ও উষ্ণ ব্যবহার পাওয়ার বা অযাচিতভাবে উদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই। তাঁরা অনেকেই সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে উচ্চশ্রেণির মানুষ নন। উচ্চমার্গের সংস্কৃতির কথা বললে অবধারিতভাবে নিম্নমার্গের সংস্কৃতি, বা বিগত এক জমানার পরিভাষায় 'অপসংস্কৃতি'-র কথা উঠতে বাধ্য। আমরা আমাদের বক্তব্যের দিক থেকে কোনটা উচ্চমার্গ, আর কোনটা নিম্নমার্গ, সেটা কী করে ঠিক হবে, এই সমস্যাজনক ব্যাপারটার মধ্যে বেশি ঢুকব না – বরং নিরপেক্ষভাবে, ভাষার শ্রেণিবিভাগের মতো এদের মার্জিত (বা তৎসম) আর প্রাকৃত, এই অর্থে ব্যবহার করব।

আলোচনা যখন অর্থশাস্ত্রের চৌহদ্দিতে ঢুকেই পড়েছে, তখন চাহিদা আর জোগানের প্রসঙ্গে না ঢুকে উপায় নেই। কোনো অঞ্চলে, যেমন ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে, উচ্চমার্গের সংস্কৃতি বস্তুটির চাহিদা আর যোগান কি নির্ভর করে সেই অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধির উপর?

যদি বাজারের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই সেই পণ্যের যোগান নির্ধারিত হয়, তবে সন্দেহ নেই, তার কিছু নির্দিষ্ট শর্ত থাকবে। ভালো গুণমানের সিনেমা-থিয়েটার তৈরি করতে হলে তার একটি ফিক্সড কস্ট বা নির্দিষ্ট বাঁধা খরচ আছে। ভালো বই ছেপে বার করার জন্যও বাঁধা খরচ আছে, আবার যত ছাপা হবে, সেই অনুপাতে খরচও আছে। ভালো ছবি প্রদর্শনীর জন্য গ্যালারি প্রয়োজন, ভালো গান-বাজনার জন্য ভালো মানের প্রেক্ষাগৃহ, রেকর্ডিং স্টুডিয়ো ইত্যাদি প্রয়োজন। অর্থাৎ, উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্যের যোগানের জন্য অর্থ প্রয়োজন। তার জন্য বেশ কিছু অর্থবান ব্যক্তি প্রয়োজন, আবার বেশ কিছু গুণী ব্যক্তিও প্রয়োজন, যাঁরা অন্য কোনো পেশায় না গিয়ে সাংস্কৃতিক পণ্য নির্মাণের কাজটি করবেন। উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক এক্সটার্নালিটিজ়-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে– অর্থাৎ, তেমন পণ্য তৈরির জন্য তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক গুণী মানুষের প্রয়োজন হয়। কিছু মাঝারি মেধার লোক জোগাড় করতে পারলেই একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি করে ফেলা যায়, কিন্তু ভালো মানের নাটক তৈরি করার জন্য উৎকৃষ্ট মেধার প্রয়োজন পড়ে।

চাহিদার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কেমন? লেখার শুরুতে হিন্দির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা ব্যবহারের চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, জীবিকার কারণে যাঁরা হিন্দির উপর নির্ভরশীল, তাঁদের পক্ষে মাতৃভাষার প্রতি গর্বকে তার ব্যবহারের চাহিদায় রূপান্তরিত করা কঠিন। এই কথাটাই একটু বৃহত্তর অর্থে যাবতীয় উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক চাহিদার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় কি? একটা ন্যূনতম আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে, সংস্কৃতির পিছনে সময় বা অর্থ ব্যয় করার মানে হল, বেঁচে থাকার অন্য কোনো জরুরি উপাদানের জন্য সময় বা অর্থ কম ব্যয় করতে পারা। কথাটা সবার ক্ষেত্রেই সত্যি – শ্রম ও অবসরের মধ্যে সময়ের বণ্টন (যাকে পরিভাষায় 'লেবার-লিজ়ার ট্রেড অফ' বলে) অর্থশাস্ত্রের একেবারে মৌলিক বিষয়গুলোর একটা। বস্তুত, কার্ল মার্কস কমিউনিজম-এর সর্বোচ্চ স্তরের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যে কল্পনাটি ব্যবহার করেছিলেন, তার মূল কথা ছিল বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আরোপিত শ্রমের বিভাজন এবং আর্থিক অনটনের দায়ে শ্রম ও অবসরের মধ্যে পছন্দসই ভারসাম্য বেছে নেবার বিলাসিতা থাকে না। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় এই টানাপোড়েন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ সকালে শিকার, বিকেলে মাছ ধরা, সন্ধেবেলা শিল্প সমালোচনা করতে পারবে, এবং এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না - অর্থাৎ অবসর যাপনের সময়ে রুজিরুটিতে টান পড়ার কথা ভাবতে হবে না। কিন্তু, সে বাস্তব এক ভিন্ন সাধনার ফল। আমরা যে দুনিয়ায় থাকি, সেখানে কিন্তু, অর্থনৈতিকভাবে একটি সীমারেখার নীচে থাকা মানুষের কাছে উচ্চমার্গের সংস্কৃতিকে বেছে নেওয়ার অর্থ, সটান রুজিরুটিতে টান পড়া। অর্থাৎ, আয় একটি ন্যূনতম স্তরে না পৌঁছোলে উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা তৈরি হয় না। কাজেই, একে বিলাসপণ্য না বলে উপায় নেই।

চাহিদা আর যোগানের অঙ্কটাকে এক সঙ্গে দেখলে উচ্চমার্গের

সাংস্কৃতিক পণ্যের বাজারের ছবিটা কেমন হবে? যত ক্ষণ না জনসংখ্যার একটা বড়ো মাপের হাতে যথেষ্ট আয়ের সংস্থান হবে, তত ক্ষণ অবধি উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা তৈরি হবে না। এবং, চাহিদা না থাকার কারণে যথেষ্ট জোগানের পরিস্থিতিও তৈরি হবে না। তার ফলে সাংস্কৃতিক পণ্যের বাজারে যা তৈরি হবে, তা হবে জনপ্রিয় কিন্তু প্রাকৃত শ্রেণির। অর্থাৎ, টুনির মা, টুম্পাসোনা, অথবা বেদের মেয়ে জ্যোৎসনা। অনেকে এই ধরনের ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্যের ভোক্তা হওয়ার জন্যে লাভ অর্জন করতে দাম বেশি ধার্য করার দরকার হবে না। তাই এই পণ্য উপভোগ করার ব্যয়ও কম, ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলেও তার চাহিদা থাকে।

প্রশ্ন হল, মানুষের আয় বাড়লেই কি প্রাকৃত সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা কমে আর মার্জিত সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা বাড়ে? প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের হাতে সময় যেহেতু সীমিত, তাই একটার চাহিদা বাড়লে অন্যটার চাহিদা কমবে। ফলে, আয় বাড়লে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা বাড়বে কি না, এই প্রশ্নের জবাব অনেকাংশে নির্ভর করছে আয় বাড়লে প্রাকৃত সংস্কৃতির চাহিদা কমে কি না, তার উপর। অর্থাৎ, প্রাকৃত সংস্কৃতি কি সস্তার জিনিসের মতো অর্থনীতির ভাষায় ইনফিরিয়র গুড বা নিকৃষ্ট পণ্য– উপভোক্তার আয় বাড়লে যে পণ্যের চাহিদা কমে? ঘটনা হল, আয় বাড়লে যেমন বিড়িসেবী মানুষ সাধারণত সিগারেট খেতে আরম্ভ করেন, বা বাংলা মদ্যের উপভোক্তা হয়ে ওঠেন স্কচ হুইস্কির রসিক, প্রাকৃত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন কথা বলা মুশকিল। যিনি আশৈশব 'প্রেম জেগেছে আমার মনে বলছি আমি তাই' শুনে যুবক হয়েছেন, আয় বাড়লেই তিনি 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে' শুনতে আরম্ভ করবেন– অভিজ্ঞতা বলে, ছবিটা ঠিক সে রকম নয়। সংস্কৃতি চরিত্রে আঠালো– লাগলে পরে ছাড়ে না!

তবে, ক্ষেত্রবিশেষে ছাড়েও বটে। উচ্চমার্গের সংস্কৃতির একটা সঙ্গপ্রভাব (যাকে পরিভাষায় পিয়ার এফেক্ট বলে) থাকতে পারে– অর্থাৎ, অবস্থার উন্নতির ফলে আমি যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে প্রবেশ করেছি, সেই শ্রেণিতে অন্যদের মধ্যে যদি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা থাকে, তবে নিজেকে সেই শ্রেণির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমার মধ্যেও উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা তৈরি হতে পারে। এটা আরো বেশি প্রকট হয় পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে যদি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা থাকে, তবে আমি নিজের সন্তানের মধ্যে সেই সংস্কৃতির প্রতি আসক্তি তৈরিতে সচেষ্ট হব, যাতে সে এই শ্রেণিতে আরো স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে।

অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির প্রতি চাহিদার জন্য উপভোক্তার আর্থিক সচ্ছলতা থাকাটা জরুরি শর্ত, কিন্তু যথেষ্ট শর্ত নয়। অন্য ভাষায় বললে, উচ্চমার্গের সংস্কৃতির জন্য চাহিদা তৈরি হতে গেলে অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে উপভোক্তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হতে হবে– কিন্তু, সামগ্রিকভাবে আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেই যে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা তৈরি হবে, এমন কোনো কথা নেই। তার জন্য প্রয়োজন একটা অন্য জিনিসের– আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির একটা যোগসূত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ, কোনো একটি সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্র যদি এমন হয় যে, তার আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চ সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত– কেউ আর্থিকভাবে, লৌকিকভাবে সফল হতে চাইলে তৎসম সংস্কৃতিতে অংশ না নিয়ে তার কোনো উপায় থাকবে না– তা হলে সেই সমাজে আর্থিক সচ্ছলতার জরুরি শর্ত হবে তৎসম সংস্কৃতিতে অধিকার। তেমন সমাজে আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তৎসম সংস্কৃতির চাহিদা বাড়বে। তেমন একটা গোটা সমাজের কথা কল্পনা যদি না-ও করা যায়, দুটো পেশাকে পাশাপাশি রেখে ভাবলে হয়তো ছবিটা বুঝতে খানিক সুবিধা হবে। গ্রুপ থিয়েটারে এক জন নাট্যকর্মীকে যদি তাঁর পেশার শীর্ষ পৌঁছোতে হয়, তবে তাঁকে তৎসম সংস্কৃতিতে সড়গড় হতেই হবে– নচেৎ তাঁর সামাজিক মূলধনই গড়ে উঠবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রোমোটিং পেশার শীর্ষে পৌঁছোতে চান, তাঁর সামাজিক মূলধনের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক বা উস্তাদ আবদুল করিম খাঁর 'যমুনা কি তীর'-এর সম্পর্ক নেই– এই বিষয়গুলিতে বিন্দুমাত্র দখল না থাকলেও তিনি তাঁর পেশার, এবং আর্থিক সমৃদ্ধির শীর্ষে উঠতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষের উদাহরণকে যদি সমাজের স্তরে নিয়ে এসে দেখা যায়, তা হলে আর্থিক সমৃদ্ধি ও উচ্চমার্গের সংস্কৃতির সম্পর্কটি বোঝা সম্ভব।

অথবা, ভাষা বা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যদি এমন কোনো খণ্ডজাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, যেখানে এই ভাষাগত পরিচিতি হয়ে উঠতে পারে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক সহযোগিতার যোগসূত্র, তা হলেও সংস্কৃতি আর আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, পশ্চিমবঙ্গের পরিসরে এমন একটা ভাষাভিত্তিক খণ্ডজাতীয়তাবাদের জন্ম হল, যেখানে বাঙালি শুধুমাত্র বাঙালির সঙ্গেই ব্যবসায়িক আদানপ্রদান করবে, শুধুমাত্র বাঙালিকেই চাকরি দেবে। এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা প্রয়োজন, এমন কোনো খণ্ডজাতীয়তাবাদের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন নেই– যে কোনো পরিচিতির ভিত্তিকেই কাউকে কোনো ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়াকে, অথবা কাউকে কোনো বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়াকে আমরা অন্যায় বলে মনে করি। এবং, এই ধরনের ব্যবস্থা যে আর্থিক ভাবে কুশলী হতে পারে না, সে কথাও নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু, কঠোর ভাবে কাউকে বাদ

দেওয়া যদি না-ও হয়, শুধু বাঙালি পরিচিতির কারণে কিছু বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়, তবে বাঙালি পরিচয়টিকে লালন করার সঙ্গে– বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হওয়ার সঙ্গে– আর্থিক সমৃদ্ধির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

লেখার শুরুতে যে প্রশ্নটা ছিল, তাতে ফিরে যাই– ভাষা বা সংস্কৃতি কি রাজনৈতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে? লেখায় যে সম্ভাবনাগুলো আলোচনা করলাম, তা এই রকম– এক, যদি রাষ্ট্রক্ষমতা জোরজবরদস্তি অন্য কোনো ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তা হলে ভাষা প্রতিরোধের অস্ত্র হতে পারে; এবং দুই, যদি ভাষা বা সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট চাহিদা থাকে, তা হলেও অন্য কোনো ভাষা বা সংস্কৃতির সামাজিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের আলোচনা গড়িয়েছে মূলত দ্বিতীয় সম্ভাবনার খাতেই। আমরা দেখেছি, ভাষা বা সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার উপায় বাংলাভাষী বহু মানুষেরই নেই। কিন্তু, এত ক্ষণ যে প্রশ্নটাকে চেপে ধরা হয়নি, তা এই রকম: ভাষা বা সংস্কৃতিকে যে 'অবাঙালি' আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, বা তা করা প্রয়োজন, এই কথাটা অনুভব করেন কত জন? পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখলে স্বীকার করতেই হয়, খুব বেশি মানুষ সেই প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কেন, সেই উত্তরের একটা আভাসমাত্র এই লেখায় থাকুক। স্বাধীনতার আগে থেকেই হরেক কারণে বাংলা ভাষার সঙ্গে, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র ক্ষীণতর হয়েছে। বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে ভিন ভাষাভাষীদের হাতে। এবং, অর্থনীতি আর সংস্কৃতি চলেছে দুটি ভিন্ন রুটের রেললাইনের মতো– একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো যোগসূত্র নেই। মূলত যে দ্বিভাষী, প্রকৃত অর্থেই বিশ্বনাগরিক বাঙালি নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে বঙ্গসংস্কৃতির উপর, বঙ্গ অর্থনীতির কলকবজার সঙ্গে তাদের দূরত্ব বিপুল। অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন উচ্চ সংস্কৃতি ক্রমশ সাধারণ মানুষের আরো দূরবর্তী হয়েছে।

এই দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা এলিট বঙ্গকূল বহু কাল করেনি। উচ্চ প্রেক্ষাগৃহ থেকে সংস্কৃতিকে কারখানার গেটে, আর হাটবারের মাঠে নিয়ে যেতে আগ্রহ দেখায়নি। বরং, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান বা ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি যে রামা কৈবর্ত আর হাসিম শেখের জন্য নয়, এটা ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সময় মুসলমানদের তুলনায় দূরে সরে থাকা নিয়ে কালান্তর-এ যা লিখেছিলেন, এই মুহূর্তে 'সংস্কৃতিমান এলিট বাঙালি' আর 'প্রাকৃত বাঙালি'র দ্বিত্ব সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে– এত দিন যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি, আজ সঙ্কটের কালে তাদের ভাই বলে ডাকলেই চলবে না। উলটোটাও হয়নি। কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আন্তরিক প্রচেষ্টা (যেমন, লোকসংগীতের ক্ষেত্রে মাদল বলে দলটি) সত্ত্বেও সাধারণ নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে লোকসংস্কৃতির যে সমৃদ্ধ ধারা তার থেকে দূরে সরে থেকেছে। এখন 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' বলে আর কী হবে।

'সংস্কৃতিমান বাঙালি' আপাতত স্বখাতসলিলে নিমজ্জমান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই লেখাটির প্রথম খসড়া পড়ে মনীষিতা দাশের অভিমত আমাদের বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে।